শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন

অধ্যাপক অমিয় মজুমদার

শিশু লালনী গ্রন্থমালা

বাবা-মা'রা সকলেই প্রতিনিয়ত শিশুকে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁদের চেষ্টা-যত্ন সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁরা ছোটদের নিয়ে নানান মুস্কিলে পড়েন—এ নিয়ে তাঁদের মনে নানান জিজ্ঞাসাও জাগে। বাস্তবিকই ছোটদের মনকে খুব ছোটবেলা থেকে ঠিক মত বুঝতে ও পরিচালিত না করতে পারলে, পরবর্তীকালে বাবা-মা'দের নানান অসুবিধায় পড়তে তো হয়ই—তা ছাড়াও মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বয়স্কদের মধ্যেও সময় সময় যেসব মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তারও মূল নিহিত থাকে শিশুকালে মন তার সহজ গতিতে বিকাশ লাভ না করতে পারার মধ্যে। কাজেই শিশুদের সেই বহুবিচিত্র মনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিভাবকরা যাতে ছোটদের স্বাধীন দেশের উপযোগী সুস্থ ও সবল-মনা প্রয়োজনীয় নাগরিক ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুপালন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত ক'রে, এই পুস্তিকামালা প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু-মনোবিজ্ঞানের মতন একটি জটিল বিষয়কে যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আপন রচনা সম্ভারে সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলার ভার নিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই—তাই আশা করি শিশু ও কিশোর কল্যাণকামী মাত্রেই এই প্রচেষ্টাকে সমাদৃত ক'রে তাঁদের সমাদর করবেন।

সম্পাদক—

শিশুলালনী গ্রন্থমালা ঃ ষষ্ঠ পুস্তিকা

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠন

অধ্যাপক অমিয় কুমার মজুমদার

কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র
হাওড়া

ভূমিকা

বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক জীবনে, বিশেষত শিক্ষার্থীর জীবনে যে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা যাচ্ছে তা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই উদ্বেগ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপর্যয় দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এবং রোগ নির্ণয় ও রোগের প্রতিকার না করে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের উপর দোষারোপ করে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে থাকি। বিদ্যালয়ে যে ছাত্র আচার আচরণে ও লেখাপড়ায় অন্যের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে তার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য শিক্ষক দায়ী করেন অভিভাবককে, অভিভাবক দায়ী করেন শিক্ষককে। আসলে, অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়ের সহযোগিতার ফলেই শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে থাকে। এই পুস্তিকায় শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের নানা দিকের আলোচনা করা হয়েছে। অভিভাবক ও শিক্ষকেরা যদি এই পুস্তিকা পড়ে শিশুর জীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইঙ্গিত পান তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

বন্ধুবর শ্রীনির্ম্মল চৌধুরীর প্রতি লেখকের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণার ফলেই এই পুস্তিকার আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলিকাতা-১২
২৫শে বৈশাখ ১৩৬১।

অমিয় কুমার মজুমদার

চরিত্র বলতে কি বুঝি

'চরিত্র', 'ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য' প্রভৃতি কথাগুলি প্রায়ই আমরা ব্যবহার করে থাকি, কথাগুলির অর্থও মোটামুটি আমরা বুঝি, কিন্তু 'চরিত্র' কথাটির সঠিক সংজ্ঞা দিতে গেলেই আমরা কেমন গোলমালের মধ্যে পড়ে যাই। চরিত্র কাকে বলে? এই কথার উত্তর দিতে গিয়ে, ন্যায়নীতি বোধ, ধর্মাধর্ম বোধ, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদির মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়ে ফেলি যে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর আর ঠিক করে উঠতে পারি না। কাজেই 'চরিত্র' সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে 'চরিত্র' সম্বন্ধে আমাদের মনগড়া ধারণাটা কি, সেটাই দেখা যাক।

সাধারণ ভাবে 'চরিত্রবান্' লোক বলতে আমরা সেই ধরণের ব্যক্তিকে বুঝি, যিনি প্রচলিত ন্যায়নীতি বোধ ও ধর্মাধর্ম বোধকে মেনে চলেন। এখন এই দৃষ্টিতে বিচার করলে অনেকের ওপরই আমরা অবিচার করে বসবো, কেন না, ন্যায়নীতির ধারণা, ধর্মাধর্মের বিচার দেশ ভেদে, কাল ভেদে নানান রূপ নিয়ে থাকে। আবার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যাঁদের আমরা শ্রেষ্ঠচরিত্রের অধিকারী বলে থাকি, তাঁদের কথা যদি বিচার করতে বসি, তাহলেও হয়তো দেখতে পাবো যে, এই সব ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। কাজেই নীতির বা ধর্মের জয়ধ্বজা তুলে চরিত্রের বিচার ঠিক করা যায় না। চরিত্র হচ্ছে এ সবের অতিরিক্ত কয়েকটি বিশেষ গুণের সমাবেশ। এর মানে এই নয় যে, চরিত্রের সঙ্গে ন্যায় নীতির কোনও যোগ নেই, বরং এতে এই প্রকাশ পাচ্ছে যে, 'চরিত্র' কথাটা আরও ব্যাপক, আরও গভীর অর্থপূর্ণ ও সুদূর-প্রসারী।

চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে আমরা শ্রদ্ধা করি তার কারণ এই নয় যে, তিনি প্রচলিত ন্যায়-নীতি ও ধ্যান-ধারণাকে সারা জীবন অন্ধভাবে মেনে এসেছেন, বরঞ্চ তাঁকে শ্রদ্ধা করি এইজন্য যে, মানুষকে পশুত্বের স্তর

থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে নিয়ে যাবার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা দমন করার মত শক্তি তিনি দেখিয়েছেন। এই অবদমন শক্তি যদি মানুষের মধ্যে না থাকতো, তাহলে মানুষ পশুই থেকে যেতো। তার মধ্যে মহত্বের বিকাশ আমরা কোন দিনই দেখতে পেতাম না।

'চরিত্র' অর্থে আমরা তাই বুঝি মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। এই আচার-আচরণকে আবার বিচার করতে হয়, ন্যায়-নীতির দিক থেকে এবং বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের দিক থেকে।

চরিত্র গঠনে বংশানুক্রমণ ও পরিবেশ

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের দিকটির কথা মানুষের মনে কেমন করে দানা বাঁধে? অর্থাৎ চরিত্রের মুল কোথায়?

মানুষ তার চরিত্র কি পিতামাতার কাছ থেকে পায়. না তার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই তার চরিত্র তৈরী হয়? এ সম্বন্ধে চরম, অভ্রান্ত কোন মত আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। তবে একথা বলা চলে যে, মানুষের চরিত্র গঠনে তার পরিবেশের প্রভাব খুব কম নয়; পিতামাতার কাছ থেকে শিশু যে স্বভাবের ধারা নিয়ে জন্মায় তার সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চলে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে তার চরিত্র সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে দুটি বিরোধী মত অবশ্য আমাদের পরিহার করে চলতে হবে। একদিকে কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক বলেন যে, মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে তার পরিবেশের দ্বারা তৈরী। এদের মতে, কোন ব্যক্তির চরিত্র গড়ে ওঠে, তার নিজের দেশের জলবায়ু, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি থেকে। এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে, মানুষ যেন এক তাল নরম মাটির মত, তাকে যেমন খুশী আমি গড়ে নিতে পারি। অপরপক্ষে কেউ কেউ বলেন

যে, মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, পিতামাতার কাছ থেকে শরীর ও মনের যে গঠন লাভ করে, তার জন্যেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। এই মতেরও দোষ হচ্ছে এই যে, এখানে পরিবেশকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ বলতে আমরা শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝি না—শুধু আলো, বাতাস, জল নিয়েই পরিবেশ নয়; পরিবেশের মধ্যে আছে প্রতিবেশী ও তার চিন্তাধারা, আছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র ও সাহিত্য ইত্যাদি অনেক কিছু।

এখন বলা যেতে পারে যে, যখন দেখি ভীরু পিতামাতার সন্তান ভীরু হয়, তখন এই কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে, পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানে বর্তায়; সন্তানের চরিত্রের মূলে তার নিজস্ব কিছু নেই। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এ ক্ষেত্রেও, পরিবেশেরই অমোঘ প্রভাব কাজ করছে। শিশু জন্মাবার পরেই লক্ষ্য করছে তার পিতামাতার চাল চলন, আর কথাবার্তা; তাকে রাস্তায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না পাছে সে গাড়ী চাপা পড়ে। স্কুলে ভর্তি করা হয়নি, পাছে সে কুসঙ্গে মিশে যায়। ঘরের ভেতর সারাদিন আটকে থাকার জন্য, পিতামাতার ব্যবহারের জন্য ধীরে ধীরে তার ভীরু মনোভাব বেড়ে উঠেছে। আরও দেখা যায়, জন্মের মুহূর্তে যে-শিশু তার পিতামাতাকে হারিয়েছে এবং যাকে লালন করা হয়েছে অন্য একটি পরিবারে, সে-শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে, তখন তার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তায় যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে সেগুলি ঐ পরিবারের নতুন পরিবেশের। এ ছাড়া আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। যে বালক অন্যায় করে, তাকে সংশোধনের জন্য তিরস্কার করা হয়, তার ভুল সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করা হয়, তাকে ভিন্ন পরিবেশে রাখা হয়। এ সকল কাজের অর্থ এই যে, বালকের চরিত্রের উপর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সচেতন। পরিবেশের পরিবর্তনে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যেতে

পারে, এই আশাতেই আমরা এই কাজ করছি।

পরিবেশের বৈচিত্র্য মানুষের চরিত্রের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, তার পরিমাপ করতে গেলে মনস্তাত্ত্বিককে উদ্ভিদবিদ্যা জীববিদ্যা, বিবর্তন-শাস্ত্র প্রভৃতি থেকে তথ্য আহরণ করতে হবে। বিজ্ঞান-জগতে মিচুরিন ও লাইসেন্‌কো এক যুগান্তর এনেছেন। এঁদের মতে, যদি উপযুক্ত অবস্থায়, উপযোগী সময়ে প্রাণীদেহের জনন-অঙ্গে বহির্জগতের প্রভাব বিস্তার করা যায় তাহলে তাদের দেহের গঠন বদলে যেতে পারে। উদ্ভিদ দেহের উপর অসামান্য যৌন ও শারীরিক প্রভাব বিস্তার করে তার বংশগতির ধারাকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। বংশানুবর্তন সম্বন্ধে এতকাল যে ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল, লাইসেন্‌কো তার অদল-বদল করেছেন। তাঁর মতে, পরিবেশের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটলে প্রাণীদেহের সেই পরিবর্তনে সাড়া দেবার ক্ষমতাকে বলা হবে বংশানুবর্তন। অবশ্য তিনি একথা অস্বীকার করেন না যে, বংশসত্তা-বাহী কণিকা বা 'ক্রোমোসোম্'-এর ভিতর দিয়ে কতগুলি বংশগত গুণের স্বাভাবিক সংক্রামণ ঘটে। কিন্তু 'ক্রোমোসোম্' গুলিই প্রাণী দেহের বৈশিষ্ট্যের প্রধান ও একমাত্র নিয়ামক নয়। 'ক্রোমোসোম্' ছাড়া প্রজনন-কোষগুলির মধ্যেও বংশগত গুণাবলী সুপ্ত ভাবে রয়েছে। আর বাইরের পরিবেষ্টনের মধ্যে উপযুক্ত পরিবর্তন আনলে সেই গুণগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

চরিত্রগঠনে গৃহ, সমাজ ও জাতির প্রভাব

লাইসেন্‌কো-র এই মত সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলছে। কাজেই একথা বলা চলেনা যে, পরিবেশের পুর্ণ প্রভাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে গৃহ, সমাজ ও জাতির প্রভাব। গৃহে পিতামাতা, দাদা, দিদি ও অন্যান্য গুরুজনের বাক্য ও ব্যবহার, চিন্তা ও কর্মের ধারা শিশুমনের উপর যে গভীর প্রভাব

বিস্তার করে—একথা সুবিদিত। সামাজিক ব্যবহার ও অনুশাসন ধীরে ধীরে অথচ সুস্পষ্টভাবে শিশুর জীবনকে গঠন করে। একই পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে তার যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় তা ধীরে ধীরে নিবিড় হয়ে ওঠে। শিশুর স্বভাবের প্রথম যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হচ্ছে নির্ভরশীলতা। সে তার পরিবারের অন্যান্য লোকের উপর নির্ভর করে, তার আহার-বিহার ও শয্যার জন্য। পরনির্ভরশীলতা অবশ্য শিশুর স্বভাবের একমাত্র লক্ষণ নয় ; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার স্বকীয় শক্তি বাড়তে থাকে ততই সে আত্ম-নির্ভর হয়ে ওঠে।

চরিত্র ও ভয়

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যে ও কৈশোরে শিশুর মনে বিভিন্ন ভাব বা 'ইমোশনের' উদয় হয়। এই 'ইমোশনের' মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী হচ্ছে ভয়। বালকের জীবনে ভয়ের সঙ্গত কারণ সবসময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। একই জিনিষ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন লোকের কাছে ভয়ের কারণ হতে পারে। কোন মনস্তাত্ত্বিক দুটি ঘটনার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভয়ের কারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলা যায় না। একটি তিনবছরের শিশু তার খেলার পুতুল আনতে গিয়ে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু তাতে সে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে পুতুলটি হাতে করে নিয়ে আসে। অন্য ঘটনাটি হচ্ছে একটি শিশু হঠাৎ উজ্জ্বল আলোতে একজোড়া পরিচিত জুতো দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল। অন্ধকারের ভয় শিশু ও বালকের একটি সাধারণ ভয়। শিশুদের যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েও দেখান যায় যে, অন্ধকার ঘরে ভয় পাবার কিছু নেই, তবুও তারা ভয় পায়। তেমনি ভয় পায় তারা বাজের শব্দ শুনে। যুক্তির সাহায্যে যদি কোন বালককে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে, বাজের শব্দ যখন শোনা যাচ্ছে, তখন আর বিপদের আশংকা

নেই, তবুও সে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। আলোর অভাবই এদের পক্ষে পীড়াদায়ক। এরা কল্পনা করে যে, অন্ধকার ঘরে নিশ্চয়ই এমন অনেক ভূতপ্রেত আছে যারা ওদের জীবনের ক্ষতি করবে।

ছোট ছেলেমেয়েদের ভূতের কাল্পনিক কাহিনী শুনিয়ে ভয় দেখানো অতি সাধারণ ঘটনা। কোন বালক যখন ভয় পায় তখন তার বিচারবুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। অনেক বয়স্ক লোকেরও অস্বাভাবিক, অহেতুক ভয় দেখা যায়। অন্ধকারে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময় তাঁরা হয়ত ভয় পেয়ে এমন একজন সঙ্গী নিয়ে থাকেন যার শারীরিক দুর্বলতা ও ভীরুতা সুবিদিত। ভয় জিনিষটা সংক্রামক। একজন ভীরু লোক স্বভাবতই নানা ভীতিপ্রদ গল্প রটনা করে থাকে যাতে অপরের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায়। অনেক ছেলেমেয়ে নিজের ভয়ের কথা স্বীকার করতে চায় না, তারা ভয় লুকিয়ে রাখে, কিন্তু তাদের ব্যবহারে ধরা পড়ে তারা ভীরু। একটি মেয়ে রাত্রে শোবার সময় মাকে রোজ বলত : আমার পুতুলের বিছানা একতলায় আছে, তুমি আমার সঙ্গে চল সেগুলো নিয়ে আসবে। পর পর তিন চার রাত মেয়ের কথা শুনে মা, তার পুতুলের বিছানা আনার সঙ্গী হলেন। কিন্তু একরাতে মা বললেন মেয়েকে একাই যেতে। মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করবার সময় খুব জোরে শব্দ করতে করতে গেল এবং খুব তাড়াতাড়িই কাজ শেষ করল। মা অনুসন্ধানে জানলেন মেয়ের ভয়, বাড়ীর সদর দরজা যদি খোলা থাকে তাহলে চোর ঢুকবে। এই জন্য সে বারবার শোবার আগে কোন অছিলায় নীচে গিয়ে দেখে আসে, দরজা বন্ধ আছে কি না।

ছোট ছেলেমেয়েদের ভয়ের মূলে আছে দেহাত্মবোধ। 'আমি ও আমার দেহ অভিন্ন', এই বোধ, বালক বালিকার জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজের সত্তাকে বজায় রাখবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আমার দেহের যাতে ক্ষতি হবে সেই জিনিষের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক

ভয়। একটি ছেলে তার বোনকে মেরেছিল। মা ছেলেকে শাসন করবার সময় বলেছিলেন: যে হাতে তুমি বোনকে মেরেছ ঐ হাতে তোমার কুষ্ঠ হবে। সেই কথা শুনে ছেলেটির মনে ভয় ঢুকেছিল এবং সেই ভয়ের ফলে তার দেহ-মন স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে পারেনি।

ছোট ছেলের জীবনে বিপদ-বোধ স্বাভাবিক বোধ; বিপদ-বোধ থেকেই আসে ভয়। যে ছেলে অথবা বয়স্ক ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এমন কিছু দেখে, যা তার জীবনকে ধ্বংস করতে পারে, তখনই তা তার মনে ভয়ের উদ্রেক করে। বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষমতা ও গুণাবলী যত বেশী হয়, ততই তার ভয়ের কারণ বাড়ে। বহু ধনসম্পদের অধিকারীরা সিপাই শান্ত্রী পাহারা রেখেও নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না, সর্বদাই তাঁদের চিন্তা, শত্রুরা হয়ত তাঁদের প্রাণ-নাশের ষড়যন্ত্র করছে।

শিশু ও বালকের জীবনে ভয় একটি স্বাভাবিক বোধ বা 'ইমোশন'। শিশুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তার জীবনের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। এই দুই অবস্থার মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতের ফলে স্বভাবতই সে ভীরু হয়ে পড়ে। এই ভয়ের জন্য শিশুকে তিরস্কার করা, উপহাস করা বা প্রহার করা অন্যায়। তাতে তার ব্যক্তিত্ব সহজ বিকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে। কাল্পনিক ভয়ের কাহিনী শুনিয়ে তাকে আরও ভীরু করে তোলার কুফলও অনেক। শিশু যখন ভয় পায় তখন বুঝতে হবে, সে বহির্জগতের সঙ্গে তুলনায় নিজকে শক্তিহীন মনে করে। তার শক্তিহীনতার বোধকে দূর করলে, তার মনে সাহসের সঞ্চার করলে, তার ভয় দুর হবে। তাকে তিরস্কার করলে বা ভয় বাড়িয়ে দিলে কোন ফল হবে না। 'গোরা'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: সংশোধনের গোড়ার কথা ভালবাসা। শিশুর ভয় দূর করতে হলে তাকে ভালবাসতে হবে, তার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতে হবে। শিশুর ভয়ের মূল কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে

গলদ কোথায়। এই গলদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, অনেক ক্ষেত্রে শিশু তার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না; এই ব্যর্থতা থেকেই ভয়ের উৎপত্তি। আবার যে সব ঘটনা শিশুর বা বালকের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় তার ভেতর থেকেও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন অতিপ্রাকৃত ভয়ানক ঘটনা থেকে যেমন স্বাভাবিক ভয় দেখা দিতে পারে, তেমনি মনের অবচেতন স্তরে যে সব ভাব, সংবেদন ও ধারণা লুকিয়ে আছে, তাদের প্রভাবেও অস্বাভাবিক ভয়ের আবির্ভাব হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, ভয়ের মূল কারণ দূর করতে না পারলে শিশুর চরিত্র গঠনে নানা ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়।

শুধু হিতোপদেশের সাহায্যে ভয় দূর করা যায় না। ভয় দূর করতে হলে চাই প্রত্যক্ষ উদাহরণ। শিশুকে ভীতিপ্রদ জিনিষের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত করতে হবে, ভীতিপ্রদ জিনিষের আশেপাশে রাখতে হবে আকর্ষণীয় জিনিষ. একদল সাহসী শিশু ও বালককে সেই পরিবেশে ছেড়ে দিতে হবে। ভীরু শিশুটি যখন দেখবে তারই সঙ্গী-সাথীরা ঐ ভীতিপ্রদ জিনিষের কাছে নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, হয়ত জিনিষটি নিয়ে খেলাধূলাও করছে তখন আস্তে আস্তে তার ভয় ভাঙ্‌বে। অনুকরণ প্রবৃত্তি শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই অন্যান্য বালক ও শিশুকে ভয়ের জিনিষের কাছে যেতে দেখলে ধীরে ধীরে তার ভয়ও কেটে যাবে। বড়দের ব্যবহার দেখেও শিশু ভয় পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু এখানে প্রয়োজন বড়দের ব্যবহারে নিখুঁত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। বড়দের ব্যবহারে যদি অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি থাকে তবে শিশু বড়দের উপর নির্ভর করতে পারে না। এমন দেখা গেছে বাড়ীর ভেতরে একটি ছেলে তার বই খাতা বা জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে রেখেছে ; তার পিতামাতা সে দিকে দৃষ্টি দেননি, তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করেননি। অকস্মাৎ কোন সম্মানিত অতিথির আগমনে বাড়ীর লোকেরা চঞ্চল

হয়ে উঠলেন এবং অতিথির সামনেই ছেলেটিকে তিরস্কার করলেন তার এলোমেলো ব্যবহারের জন্য। শিশু এই ব্যবহারে বিস্মিত হয়। তার মনে প্রশ্ন জাগে: যে-ব্যবহার বাড়ীর লোকের সামনে দোষের নয় তা অতিথির চোখে দোষের হবে কেন? এইজন্য শিশুর মনোরাজ্যে প্রবেশ ক'রে জানা দরকার যে, সে বড়দের সম্বন্ধে কী ভাবে এবং বড়দের কী চোখে দেখে। এ-কাজটি অবশ্য খুব সহজ নয়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সার্থক।

ভয় ও হীনমন্যতা বোধ

শিশু ও বালক যতই প্রতিকূল পরিবেশের কাছে নিজেকে শক্তিহীন মনে করে, ততই তার আত্মবিশ্বাস কমতে থাকে: নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সে মর্যাদা হারিয়ে ফেলে; সে নিজেকে অত্যন্ত হেয় ও অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে। এই বোধকেই মনস্তাত্ত্বিকেরা **inferiority complex** বলেছেন। বালকের নিজের দেহের গঠন ও সমাজের অন্য লোকের তার প্রতি ব্যবহার এই দুইটি জিনিষ মিলে তার মনে "হীনমন্যতা" ভাবের সঞ্চার করে। একথা বললে অবশ্য অন্যায় হবে যে, দেহের গঠনে অস্বাভাবিকতা থাকলেই মানুষের মনে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি লঘুতার ভাব দেখা দেয়। এমন দেখা গেছে যারা বয়সের তুলনায় অতিমাত্রায় খর্ব, যাদের চেহারা অস্বাভাবিক ও অসুন্দর তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নিজের প্রতি হেয় ভাব নেই। নিজের চেহারা আমরা সবসময়ে নিজে না দেখলেও, আমার চেহারা কেমন দেখতে, এ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই মোটামুটি ধারণা আছে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, কোনো কোনো সময়ে আমরা কোন কাজ করবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ও সক্রিয় হয়ে পড়ি। পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূল ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করবার শক্তি আমার কী পরিমাণে আছে, এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই একটা মোটামুটি ধারণা থাকে। এই ধারণা অনুসারেই জীব ও জগৎ সম্বন্ধে

প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে থাকে। দেহ হচ্ছে এমন একটি উপযোগী যন্ত্র, যার মাধ্যমে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হয়। পাহাড়ে উঠবার সময় যে লাঠির উপর ভর করে আমাকে উঠতে হচ্ছে, সেই লাঠি যদি বেঁকে যায় তাহলে যেমন আমার মন বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে, তেমনি দৈহিক বিকৃতি, অবসাদ ও রোগের জন্য অনেক সময় মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটলেই দেখা দেয় নিজের সম্বন্ধে হীনতা বোধ।

দৈহিক বিকৃতি ও অক্ষমতার জন্য যে-হীনতা-বোধের উৎপত্তি হয়, সে সম্বন্ধে মানুষ যতই সচেতন হতে থাকে, ততই অন্য ভাবে সে এই দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। যদি কোনো লোকের দেহের কোন অঙ্গ অকেজো হয়ে পড়ে, তাহলে সে সেই অঙ্গকে অন্যান্য অঙ্গের চাইতে বেশী সক্রিয় করে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। প্রত্যেক মানুষের শারীরিক যোগ্যতা সম্বন্ধে একটি সাধারণ জ্ঞান আছে। এই যোগ্যতা পরিমাপ করবার অবশ্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবুও যখনই আমি বুঝতে পারি যে, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতায় আমি সাধারণ মানুষের থেকে ছোট হয়ে পড়েছি, তখনই আমার আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বেশী জাগ্রত হ'য়ে উঠবে। এই প্রবৃত্তির অন্য নাম শক্তি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। যে-সব লোক খর্বাকৃতি, তাদের এই দৈহিক দোষের ধারণা যদি বদ্ধমূল হয়, তবে অন্যভাবে তারা এই দোষের ক্ষতিপুরণ ক'রে থাকে। যেমন ধরা যাক নেপোলিয়নের কথা। নেপোলিয়ন ছিলেন খর্বাকৃতি, কিন্তু এই হীনতা-বোধ থেকেই তাঁর প্রেরণা জেগেছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য। সেই ভাবে এই ক্ষতিপুরণ হয়েছিল। গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্‌থিনিস্‌ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যেতে পারে। তিনি ছিলেন তোৎলা, কিন্তু সাধারণ মানুষের মত বাক্‌শক্তি পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন নি, বাক্‌শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন করেই তিনি তাঁর বিশিষ্ট অঙ্গের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন।

যে অঙ্গের বিকাশ পরিপূর্ণ ভাবে হয়নি, ক্ষতিপূরণ সবসময়ে সেই অঙ্গ থেকেই আসে না। অন্য অঙ্গের সাহায্যেও ক্ষতিপূরণ হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, খর্বাকৃতি লোকেরা অন্য লোকের মত সাধারণ ভাবে কথা না বলে একটু বেশী চীৎকার করে কথা বলেন। তাঁদের মনের ভাব অনেকটা এই রকম, 'আমি দৈহিক উচ্চতায় তোমার চাইতে ছোট হতে পারি, কিন্তু আমার গলার জোর কম নয়!'

'হীনমন্যতা' বোধ থেকে শিশুর চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটে তা অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে। সেই জন্য 'হীনমন্যতা-বোধ' বা শিশুর নিজের প্রতি মর্যাদার অভাব এমন একটি দোষ যা সংশোধন করতে হলে খুব সতর্ক ভাবে অগ্রসর হতে হবে।

পরিবেশ ও শিশুর চরিত্র

শিশুর পরিবেশের জন্য তার চরিত্রে যে সব দোষত্রুটি দেখা যায় তার জন্য আমরা সাধারণত তার পিতামাতা, অন্যান্য গুরুজন, খেলার সঙ্গী ও শিক্ষককে দায়ী করে থাকি। এই পরিবেশের প্রভাব এত ব্যাপক ও সুগভীর যে, কোন দুষ্টু ছেলের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে, ছেলেটি স্বভাবতই দুষ্টু। আমি ও আমার জগৎ দু'য়ের ভিতর ঘাত-প্রতিঘাতেই আমার চরিত্রের বিকাশ। শিশুর জগৎ বলতে তার আত্মীয়স্বজন, তার বাড়ী, খেলার সামগ্রী, প্রতিবেশী—সব কিছুই বুঝতে হবে। অনেক সময়ে কোন দুরন্ত ছেলের মাকে বলতে শোনা গেছে: আমিত সব কটি ছেলেমেয়ে একভাবে লালন-পালন করেছি, এটি এমন সৃষ্টিছাড়া হোল কেন? এই প্রশ্নটি আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। মা তাঁর সকল সন্তানকে সমান ভাবে লালন করেন, একথা সত্যি নয়। পরিবারের মধ্যে কোন্ সন্তান বড়, কোন্‌টি ছোট, কে পরিবারের সচ্ছল অবস্থার ভিতর জন্মেছে, কে সে-অবস্থায় জন্মায়নি, কোন্‌টি ছেলে, কোন্‌টি মেয়ে,

কোন্ টির ভাল সঙ্গী আছে, কোন্ টির নেই—এই সব অবস্থার উপর শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক খানি নির্ভর করছে। পিতামাতার সন্তানদের প্রতি ব্যবহারে অনেক সময় বৈষম্য থাকে, সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয় না, কাউকে বেশী আদর দিয়ে পরিবারের লোকেরা মাথায় তোলেন, আবার অন্য সন্তানটিকে তাচ্ছিল্য করেন; পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের ব্যবহারে সন্তান কখনও দেখে অতি-কঠোরতা, কখনও দেখে অতি-কোমলতা। পিতামাতার স্বভাবে এই বিরোধ, শিশুর মনে জাগায় বিস্ময় ও বিভ্রান্তি। ছোট ছেলেটিকে হয়ত কোনদিনই কোন গুরু দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া হয়নি—যদিও তার ক্ষমতা সংসারের বড়ছেলেটির চাইতে কোন অংশে কম নয়। তবুও এই অপরীক্ষিত ধারণার উপর নির্ভর করে পিতামাতা বড়টির সঙ্গে ছোটটির তুলনা করে ছোটকে অকারণে তার অকর্মণ্যতার জন্য তিরস্কার করে থাকেন। এর ফলে শিশু তার বড় ভাই-বোনদের প্রতি ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে, নিজের উপরেও তার বিশ্বাস ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে।

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যখন আইনসঙ্গত ভাবে বিচ্ছেদ ঘটে ও আদালতের নির্দেশ অনুসারে স্থির হয় যে বিচ্ছিন্ন স্বামীস্ত্রীর একমাত্র ছেলেটি বছরের ছ'মাস পিতার কাছে ও ছ'মাস মাতার কাছে লালিত হবে তখন তার বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। বিচ্ছিন্ন স্বামী ও স্ত্রীর রুচি ও প্রকৃতি স্বভাবতই ভিন্ন প্রকারের। কাজেই শিশুর চরিত্র এই দোটানার ভেতর পড়ে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। শিশুর জীবনে এমন বিপর্যয় ও বিভ্রান্তি আসে যার ফলে সে হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই এমন এক দ্বৈতসত্তাকে নিজের জীবনের মধ্যে পোষণ করতে থাকে, যাতে সে মা ও বাবা উভয়কেই সুখী রাখতে পারে। এই ধরণের বিড়ম্বিত জীবন সংশোধন করবার উপায় কি? সংশোধনের জন্য কতটুকু কঠোরতার প্রয়োজন আর কতটুকু কোমলতার?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অপরাধ ও শাস্তির নৈতিক তাৎপর্য কি সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই।

অপরাধ ও শাস্তি—শাস্তির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ পিতামাতার এবং রাষ্ট্র বা সমাজের অনুশাসন মেনে চলতে হবে এবং না মানলে শাস্তি পেতে হবে, এ-শিক্ষা শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয়ে থাকে। ন্যায় ও অন্যায়ের বোধ ও শাস্তির সার্থকতা সম্বন্ধে শিশুকে প্রথম থেকেই সচেতন করে তোলা হয়। অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হয় কেন ? ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ কি মানুষের সৃষ্টি নয় ? এ সব প্রশ্ন স্বভাবতই বালকের মনে জাগে। শাস্তির সার্থকতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত নন। কেউ কেউ বলেন, প্রাকৃতিক জগতে যেমন প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তেমনি নৈতিক জগতে অন্যায়ের জন্য শাস্তি পেতেই হবে। একটি 'বল' উপরে ছুঁড়লে যেমন সেটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে নীচে পড়বে, তেমনি অন্যায় কাজের জন্যও শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য আমরা যে-জগতে বাস করছি সে-জগতে অন্যায়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে হয় না এবং অপরাধীও সবসময় শাস্তি পায় না। কিন্তু এঁরা বলেন, রাষ্ট্র শাস্তি না দিলেও অপরাধী এক সময়ে অনুশোচনার ভিতর দিয়ে শাস্তি পাবে অথবা পরলোকে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দেবেন। অপর মতে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য তাকে সংশোধন করা নয় ; যাতে শাস্তির গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে, ভবিষ্যতে কেউ ভয়ে আর এ-জাতীয় অন্যায় কাজ না করে এইটাই হল শাস্তিদানের লক্ষ্য। একজন বিচারপতি অপরাধীকে শাস্তি দানের সময় বলেছিলেন, 'তুমি গরু চুরি করেছ বলে তোমাকে শাস্তি দিচ্ছিনা ; ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ গরু চুরি না করে সেই কথা মনে রেখেই তোমাকে শাস্তি দিলাম'।

আধুনিক সমাজতত্ত্ববাদীরা এই দুটি মতের একটিও গ্রহণ করেন না। প্রথম মতের বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি এই যে, এই মতে শাস্তি দানের

মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার প্রবৃত্তিই মাথা উঁচু করে উঠেছে। তাছাড়া প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে নৈতিক জগতের অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের জগতের তুলনা করা চলে না। কারণ, প্রাকৃতিক জগত অমোঘ নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ আর নৈতিক জগত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় মুক্ত। মানুষ অন্যায় কাজ করতে পারে আবার নাও করতে পারে; এই বিকল্পের মধ্যে তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সে একটিকে বেছে নিয়েছে। অন্যায় কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তার নিজের, এইজন্যই তাকে শাস্তিদান করা চলে। কিন্তু মানুষের অন্যায় কাজ যদি প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ত তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। দ্বিতীয় মতের বিরুদ্ধে আধুনিক সমাজতত্ত্ববাদীদের আপত্তি এই যে, এই মতে মানুষের মর্যাদা-বোধকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। অপরাধীও মানুষ, তার ব্যক্তিত্বকেও মর্যাদা দিতে হবে। পাপকে ঘৃণা করবে—কিন্তু পাপীকে নয়। পাপীকে ভালবাসলে, দরদী মন নিয়ে তার ভুল দেখিয়ে দিলে তবেই সে সংশোধনের পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় মতে অপরাধীকে ব্যবহার করা হয়েছে একটি যন্ত্র বা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে। তাকে শাস্তি দিয়ে অপরকে ভয় দেখানো হচ্ছে এই কথা বলে, 'তুমি যদি অপরাধ করো, তোমারও এই দশা হবে।' ভয়কে আশ্রয় করে কখনও মানুষের সুস্থ নৈতিক বোধ জাগতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক মনোবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী অপরাধকে দেখেছেন মানসিক রোগ হিসাবে। অনেক সময় প্রতিকূল পরিবেশের চক্রান্তে মানুষ অন্যায় করে, অনেক সময় ক্ষণিকের ভুলে কেউ অপরাধ করে ফেলে। কাজেই অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলে তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যা সে নিজের "প্রাপ্য" বলেই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে।

চরিত্র ও আনুগত্য

অপরাধীকে শাস্তি দিতে হলেই তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার

করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। শিশু বা বালককে শাসন করবার নামে নির্দয় ভাবে প্রহার করলে কখনই সুফল পাওয়া যায় না। নির্দয় শাস্তি বা দণ্ডদানের পেছনে রয়েছে দণ্ডিতের সম্বন্ধে ও কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। রাষ্ট্র বা সমাজের কাছ থেকে যখন দণ্ড আসে, তখন আমরা মনে করি রাষ্ট্র ও সমাজ স্বয়ং-সর্বস্ব এবং স্বপ্রতিষ্ঠ; রাষ্ট্রের অধিকার ও ক্ষমতা অমোঘ ও সীমাহীন। কাজেই সমাজ রাষ্ট্র বা পরিবারের প্রধান যদি নির্দয় হন তাহলেও সে-দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে। এই ধারণা নিতান্তই ভুল ধারণা। রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যক্তির কল্যাণের জন্যে; 'রাষ্ট্রের জন্যেই রাষ্ট্র' বা 'সমাজের জন্য সমাজ' এ-কথা স্বীকার করা চলে না। কাজেই নির্দয় শাস্তির ফল যদি কল্যাণের না হয়, তাহলে কখনই তা অনুমোদন করা চলে না। প্রভুত্বের (authority) প্রতি আমাদের যে আনুগত্য, তা প্রভুর দেহ-মনের সম্পর্কে নয়, প্রভু বা কর্তা পদাধিকার বলে যে সত্তা গ্রহণ করেন তার প্রতিই আমাদের সম্ভ্রম ও প্রণতি। প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে ব্যক্তিটির মুল্য তত নয়, যতখানি তার পদের। সৈনিক কুচকাওয়াজের সময় তার অধ্যক্ষকে যে অভিবাদন জানায়, তা সেই ব্যক্তি শ্রীঅমুক চন্দ্র কে নয়, তার পদাধিকারের প্রতি। প্রভুকে সেই জন্য পদের যোগ্য হতে হবে, রাজাকে সিংহাসনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, পিতাকে অর্জন করতে হবে পরিবার প্রধানের মর্যাদা। পদের যিনি অধিকারী তিনি সকল সময়ে পদমূল্যের যোগ্য হন না, এই খানেই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ট্র্যাজেডি। পদমর্যাদার সঙ্গে জড়িত থাকে পদের সুগভীর দায়িত্ব। পদাধিকারী যদি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না থাকেন, যদি কোন ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে সমষ্টি-জীবনে যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তা সহজে দূর করা যায় না। পরিবার, সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কর্তা যখন অপরাধীকে নির্দয় শাস্তি

দেন, তখন তাঁর মনে পদাধিকারের মিথ্যা অভিমান থাকে। যদিও তিনি প্রকাশ্যে বলেন যে, অপরাধীর মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি কঠোর দণ্ড দিয়েছেন ; তবুও সকল ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কঠোর দণ্ডদানের মূলে মিথ্যা পদ-গর্ব বোধও কাজ করছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, আমাদের ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবন এত জটিল ও বিস্তৃত যে, সুষ্ঠু শাসনের জন্য পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন প্রধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রধানের অভাবে সমষ্টিজীবনে আসে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। কর্তা অথবা প্রধানের প্রতি আনুগত্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে সুস্থ, সবল, প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ও সমষ্টির মূল্যায়ন। সমষ্টির মূল্য সম্বন্ধে সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কর্তার কর্তৃত্ব তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয় প্রেম ও সহানুভূতির উপর।

কোন একসময়, ইংলণ্ডের রাজা, ইংলণ্ডের কোন একটি স্কুল পরিদর্শন করতে যান। তিনি যখন স্কুলের বিভিন্ন ঘর, অঙ্গন প্রভৃতি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, তখন স্কুলের শিক্ষক ও অন্য কর্মচারীরা মাথার টুপি খুলে রেখেছিলেন রাজার প্রতি সম্ভ্রমের নিদর্শন হিসাবে। কেবল প্রধানশিক্ষক মহাশয় তাঁর মাথার টুপি খোলেন নি'। তাঁর এই ব্যবহারে কেউ ক্ষুব্ধ, কেউ বিস্মিত হয়েছিল। রাজা স্কুল-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করবার পরে প্রধান শিক্ষক মহাশয় অন্যান্য শিক্ষক ও স্কুল কর্মচারীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আমি ইচ্ছা করেই মাথার টুপি খুলিনি, কারণ, যদি আমি টুপি খুলে খালি মাথায় রাজার সঙ্গে যেতাম, তাহলে আমার ছাত্রেরা বুঝতে পারত যে, দেশের রাজা আমার চাইতে বড় এবং সম্ভ্রমের পাত্র। এর ফলে ছাত্ররা আমাকে এতদিন যে-শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখিয়েছে ভবিষ্যতে তার চাইতে কম সম্ভ্রম দেখাত। আমার চাইতে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র কেউ আছে

একথা আমি ছাত্রদের বুঝতে দিতে চাই না।" সমাজের সংহতি রক্ষার জন্য কর্তা বা প্রধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবুও একথা ভুললে চলবে না যে, প্রধানের কর্তৃত্ব যেন দম্ভ ও ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। প্রধানের কর্তৃত্ব খুব কঠোর ও ভীতিপ্রদ হলে বালক বালিকার মন এত সংকুচিত হয়ে পড়ে যে, ক্রমশ প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে, সমাজ-প্রধান ও সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান বাড়তে থাকে। শিশু ও বালকের মনে থাকে অজস্র জিজ্ঞাসা। তার মন অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু। তার অনুসন্ধানের পরিতৃপ্তি না করে আমরা অনেক সময় তাকে এই বলে নিরস্ত করি, "বড় হলে জানতে পারবে, এখন নয়।" এই কথা শুনতে শুনতে শিশুর মনে 'বড়' ও 'ছোট' এই দুয়ের বিরোধ পাকা হয়ে ওঠে। শিশু দেখে তার পিতামাতা, গুরুজন প্রভৃতি অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী, অপরিমিত কর্মের অধিকারী ; তাদের সামনে সে নিজকে মনে করে অত্যন্ত খর্ব, অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তার মনে সন্দেহ জাগে যে, সে হয়ত কোনদিনই বিদ্যা বুদ্ধিতে তার পিতামাতা বা অন্য গুরুজনের সমান হতে পারবে না। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস তার মনের স্বাভাবিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি ক'রে থাকে। শিশু ও বালক স্বভাবতই ভাবপ্রবণ, তারা আদর্শবাদী, বাস্তব জগতের তুলনায় কল্পনার জগৎ তাদের কাছে বেশী প্রিয়, বেশী শক্তিশালী। শিশুকে যদি ছোট বেলা থেকে বুঝতে দেওয়া যায় যে, সেও একদিন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং কর্মে তার পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সমান হয়ে উঠবে অথবা তাদের ছাড়িয়ে যাবে, তাহলে শিশুর মনের ব্যর্থতা, গ্লানি ও অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। আরও একটা কথা, কল্পনায়-গড়া মহাপুরুষদের কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবের দেখা মহাপুরুষদের কর্ম ও জীবন তুলনা করলেও, শিশু ও বালকের মনে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে এক সামঞ্জস্য দেখা দিতে পারে।

চরিত্রগঠনে কল্পনার স্থান—আদর্শের প্রতি অনুরাগ

কিশোরের জীবন কল্পনাপ্রবণ। কিশোরের চরিত্র গঠনের জন্য এই কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিশোরের জীবনের সামনে সেই জন্য এমন উঁচু আদর্শ তুলে ধরতে হবে, যাতে সে তার নিজের জীবনকে সুন্দর ও মহান ক'রে গড়তে পারে। নিয়মশৃঙ্খলা-বোধ, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি আদর্শই হবে কিশোরের জীবনাদর্শ। এই আদর্শে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনা ক'রে দেখানো যে, তাঁদের জীবনে এই আদর্শ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য হবে, তাঁদের কর্মে ও বাক্যে, প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি ব্যবহারে এই আদর্শের প্রয়োগ। গুরুজনদের ব্যবহারে অসঙ্গতি থাকে বলেই কিশোর-কিশোরীরা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। প্রাত্যহিক জীবনে গুরুজনেরা অনেক সময় ছোটখাট ব্যবহারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকেন অথচ সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বলেন সত্যনিষ্ঠ হতে। এই অসঙ্গতি কখনও সুফল দিতে পারে না। পিতা কোন অবাঞ্ছিত লোকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে চুপি চুপি ছেলেকে হয়ত নির্দেশ দিলেন, "ঐ লোক-টাকে বলে দে বাবা বাড়ীতে নেই"। পিতার এই ব্যবহারে ছেলের মনে ঢুকল সন্দেহ ঃ হয়ত নিজের বিশেষ প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধেও একই কথা। ঘণ্টা বাজবার অনেকক্ষণ পরে ক্লাসে ঢোকা যে-শিক্ষকের অভ্যাস, তিনি যদি নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহলে সে উপদেশ ব্যর্থ হতে বাধ্য। "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়"—এই কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি না করলে, কিশোরের জীবনে মহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো সম্ভবপর নয়।

সত্যকথা বলতে ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ভয় পায় এই জন্য যে, সত্যকথা বলার ফল হবে পিতামাতার কাছ থেকে

তিরস্কার ও প্রহার লাভ। এই ভয় দূর করতে না পারলে ছেলেমেয়েরা কোনমতেই সত্যনিষ্ঠ হতে পারবে না। আবার অনেক সময় দেখা যায়, পিতা শাসনের সুরে কোন একটি কথা আদায় করবার জন্য পুত্রকে বলছেন : 'বল্, কোথায় ছিলি এতক্ষণ, কোন ভয় নেই, কিছু বলবো না।' পুত্র সত্য কথাটি যখন প্রকাশ করল, তখনই পিতা উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। পুত্রের সত্যকথা বলার পুরস্কার হলো সারাদিন উপবাস ও নির্দয় প্রহার। পিতার ব্যবহারে এই অসঙ্গতি পুত্রের জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। পুত্র ধীরে ধীরে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে ; বেশী করে মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সত্য, ন্যায়, সাম্য প্রভৃতি আদর্শ শিশু ও কিশোরের জীবনে সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তার প্রধান কারণ, শিশুর পক্ষে অমূর্ত ভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে সুদীর্ঘ সময় ও আয়াসের প্রয়োজন। সেই জন্য শিশু ও কিশোরকে অমূর্ত ভাবের সাহায্যে শিক্ষা না দিয়ে, পরিচিত লোকের জীবনের ঘটনার সাহায্যে শিক্ষা দিলে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়। কখনও কখনও শিশু ও কিশোরের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। তাকে একথা বোঝানো যেতে পারে যে, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যদি সকল সময়ে মিছে কথা বলে, তা হলে কী পরিণাম হয়—জীবন যাত্রাই অচল হয়ে পড়ে। তেমনি সকলেই যদি সকল সময়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তাহলে 'প্রতিজ্ঞা' কথাটি অভিধান থেকে উঠে যায়। এই সকল উদাহরণের সাহায্যে তার বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত করলে সে বুঝতে পারে যে, যে-জিনিস দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়, তারও সত্তা আছে। ন্যায়, সত্য, শিব ও সুন্দর তাই কল্পনাবিলাস নয়, জীবনের মূল্যবোধের মধ্যেই তার প্রতিষ্ঠা।

চরিত্র ও বিবেক

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিবেকই আমাদের আচার

আচরণকে অনেকাংশে সংযত করে থাকে। কোন্‌টা ন্যায় বা কোন্‌টা অন্যায় সে বিষয়ে অন্যকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। এই ন্যায়-অন্যায় বোধ বা বিবেক কিন্তু একটা বিধি-দত্ত জিনিস নয় বা কোন একটা বিশেষ বয়সের ধর্ম নয়। পারি-পার্শ্বিক থেকেই ধীরে ধীরে মানুষের মনে ন্যায় অন্যায় বোধ গড়ে ওঠে। সেই ভাবে অনেকাংশেই তার আচার আচরণও পরিচালিত হয়। মানুষের মনে ন্যায়-অন্যায় বোধ কি ভাবে গড়ে ওঠে তাই দেখা যাক।

অতি শৈশবে, মা যে মুহূর্তে ভ্রূভঙ্গির দ্বারা বা হাসির দ্বারা শিশুর আচরণের বিচার করতে সুরু করেন, সেই মুহূর্ত থেকেই শিশুর মনে এই ধারণার বীজ বপন সুরু হয়। সে বুঝতে পারে যে তার আচরণের মধ্যে এমন জিনিস আছে যার কতগুলি মা পছন্দ করেন আর কতগুলি পছন্দ করেন না। শিশুর কাছে মা-ই তার সমস্ত কিছু সুখ-সুবিধা, আরাম-আশ্রয়ের আধার। তাই সে সাধ্যমত চেষ্টা করে মা'র পছন্দমত কাজ করবার। এই সময় নিজের আচার আচরণের ওপর তার বড় একটা হাত থাকে না—মা-বাবার কর্তৃত্বেই তা পরিচালিত হয়। তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ বা ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শ সে আপন সত্তার মধ্যে গ্রহণ করে ও সেইমত চলতে চেষ্টা করে। মা-বাবার কর্তৃত্বই তার মনের মাঝে "বিবেক বাণী" হয়ে কথা বলতে থাকে। তাঁদের অবর্তমানেও শিশু তাই তাঁদের পছন্দ মতন কাজ করতে সচেষ্ট হয়।

পরবর্তী কালে পরিবারের বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শিশু যখন মিশতে আরম্ভ করে, তখন সে দেখে যে, নিজের সুখের জন্যই তার অনেক আচার-আচরণ বর্জন করা দরকার। তা নইলে অন্য শিশুরা তার সঙ্গে মিশতে চায় না, খেলতে চায় না। এমনি ভাবে শিশু অন্যের পছন্দ অপছন্দকে মর্যাদা দিতে শেখে। তার মনে সামাজিক ন্যায় অন্যায় বোধ জাগ্রত হয়। বয়স বাড়বার সাথে

সাথে সঙ্গীসাথী, দাদা-দিদি, শিক্ষক, কিশোর-পরিচালক ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে ন্যায়-নীতির আদর্শ সম্বন্ধে তার বেশ একটা ধারণা জন্মায়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে বাবা-মার কাছ থেকে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা জন্মায়, সেটা বরাবরই তার দৈনন্দিন আচার আচরণকে খুব বেশী রকম প্রভাবান্বিত করে এবং তার চরিত্রকে বিশেষ রূপ দান ক'রে থাকে।

আমাদের আলোচনা থেকে সহজেই এই কথা বলা যেতে পারে যে, যেখানে মা-বাবার মধ্যে ন্যায়-নীতির ধারণা সকল অবস্থাতেই উচু, সেখানেই শিশুর চরিত্রের মধ্যে সদ্‌গুণগুলির বিকাশ লাভ করার সম্ভাবনা বেশী।

শিশুর ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কাছে ন্যায়—ন্যায়ই আর অন্যায়—অন্যায়ই, এ দুইয়ের মাঝখানে পড়লে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তার মনে অনিশ্চয়তা, উদ্বিগ্নতা দেখা দেয়। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে মা-বাবার মতবিরোধ থাকলে শিশুর আচার আচরণের ওপরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অন্যায় ক'রে একজনের কাছে বকুনী খেলে সে আর একজনের কাছে সহানুভূতি পায়, ক্রমান্বয়ে এইরকম চলার ফলে চারিত্রিক দৃঢ়তা গড়ে উঠতে পারে না। মা-বাবার অভাব, দুঃসহ দারিদ্র্য, জড়বুদ্ধি ইত্যাদি শিশুর ক্রমবর্দ্ধমান ন্যায়-অন্যায় বোধকে ব্যাহত বা বিকৃত ক'রে থাকে।

চরিত্র ও আত্মমর্যাদা বোধ

আমরা দেখেছি যে, উন্নততর আদর্শ বা যথার্থ নীতিবোধ মানুষের মনে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। শিশুর মনে আদর্শ গড়ে ওঠার পথে ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব তাকে অনুপ্রাণিত করে থাকে। মোট কথা হলো নীতি বা বিবেকবোধ গড়ে তুলতে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এখন ন্যায়-নীতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মানোটাই বড় কথা নয়; সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই আসল

কাজ। যথার্থ ন্যায় কি তা জেনেও প্রায়ই অপরাধী অপরাধ ক'রে থাকে। কাজেই ন্যায় অন্যায় শুধু জানলেই হয় না, তা ব্যক্তিত্বের মধ্যে মিশিয়ে না ফেলতে পারলে তার কোন তাৎপর্য থাকে না। এর জন্য দরকার যথার্থ আত্মমর্যাদা বোধ। যথার্থ আত্মমর্যাদা বোধই হচ্ছে চরিত্রের পরিচালক। মনীষী নান বলেন, "আত্ম শ্রদ্ধাই হচ্ছে আমাদের বিবেক ও তার অনুবর্তী নীতিবোধের বাহন।" কোন মানুষকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে হলে তার যথার্থ আত্মমর্যাদা বোধকেই আগে ফিরিয়ে আনা দরকার।

লক্ষ্য করা দরকার যে আত্মমর্যাদা বোধের আগে আমরা 'যথার্থ' কথাটা ব্যবহার করেছি। এর কারণ অযথা অত্যধিক আত্মমর্যাদা বা আত্মসম্মান বোধ মানুষের চরিত্রের মধ্যে, অহঙ্কার, ক্ষমতার অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয় ভাব এনে থাকে। আবার অন্য দিকে আত্মমর্যাদা বা আত্মসম্মান বোধ একেবারে না থাকলে মানুষ আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে কি না সন্দেহ। আত্মমর্যাদা বোধ আমাদের ন্যায়-নীতি বোধকে কার্যকরী রূপ দিয়ে চরিত্র গঠনে সহায়তা করে।

ছোটদের চরিত্রে এই আত্মমর্যাদা বোধকে জাগাতে হলে অভিভাবকদের নিজেদের জীবনে এই আত্মমর্যাদা বোধকে উচ্চ স্থান দিতে হবে। শিশুদের কাছে আত্মসম্মানের আদর্শকে গল্প, আদর্শ-চরিত্র, ইতিহাস ইত্যাদির মারফত তুলে ধরতে হবে। মাঝে মাঝে "তুমি অমুক স্কুলের ছেলে" বা "অমুক দেশের ছেলে—তোমার কি এমন করা উচিত", ইত্যাদি বলে আত্মসম্মান বোধকে জাগানো ভালো। আত্মমর্যাদার মূল্যকে কোনক্রমেই ছোট করলে হবে না। তাদের মনে ক্রমাগত এই ধারণা জাগালে হবেনা যে, তারা অসৎ তাদের আশা ভরসা নেই, তারা গোল্লায় গেছে—চেষ্টা করেও তারা কোনদিন আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হতে পারবে না। এর বদলে অভিভাবক-দের নিজেদেরও যেমন উন্নততর চিন্তা ও আদর্শকে অনুসরণ করতে

হবে, তেমনি সৎ ও আদর্শ জীবনের মহিমাকেও ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে বড় করে দেখাতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে সমষ্টি জীবনে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সত্য-প্রীতি, সরলতা, নিয়ম শৃঙ্খলানুরাগ ইত্যাদি উন্নত আদর্শের মূল্য কতখানি।

চরিত্র ও ধর্মশিক্ষা

অনেকেই মনে করেন যে নৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে হলে শিশুদের জীবনে ধর্মশিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। নৈতিক জীবনের অর্থ যদি সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা, নম্রতা, সর্বভূতে প্রীতি, দানশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি গুণগুলি আয়ত্ত করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, ধর্মশিক্ষা ব্যতিরেকেই এগুলি আয়ত্ব করা যেতে পারে। সত্যকারের যিনি মহৎ ব্যক্তি, তাঁর চরিত্রে স্বভাবতই এগুলি দেখা যায়। এর জন্য বিশেষ ভাবে ধর্মশিক্ষার অথবা বিশেষ কোন ধর্মমত প্রচারের প্রয়োজন হয় না। অন্য দিকে কিন্তু যিনি 'ধর্মশীল' বলে পরিচিত তাঁর মধ্যে যদি এই গুণগুলির অভাব থাকে তাহলে তাঁকে আমরা ধার্মিক বলতে ইতস্তত করবো। আসলে মানুষের ধর্ম হচ্ছে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণময় তাকে সমগ্র জীবন দিয়ে উপলব্ধি করা, ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে তাকে রূপায়িত করা। অর্থাৎ সেই প্রাচীন ঋষিদের কথায় বলতে হয়, "ধ্রিয়তেতি ধর্ম" মানুষের মনুষ্যত্বকে যা ধারণ করে রাখে, তাই মানুষের ধর্ম। যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠবে, সেই শিক্ষাই ধর্মশিক্ষার অঙ্গ হয়ে উঠুক। অন্ধ-সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, নরকের ভয় যেন শিশুদের ধর্ম শিক্ষার অঙ্গ না হয়।

যৌন চেতনা ও চরিত্র

সাধারণ অভিভাবকদের ধারণা যে, শৈশবে শিশুদের যৌন বোধ বা যৌন চেতনা বর্তমান থাকে না, যৌবনেই এ চেতনা তাদের মধ্যে

প্রথম দেখা দেয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা অজ্ঞতাকেই পবিত্রতার প্রতীক বলে মনে করে থাকেন, এবং আশা করেন যে, কোন রকম শিক্ষা ব্যতিরেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েরা হঠাৎ রাতারাতি সুস্থ যৌন-চেতনা সম্পন্ন বয়স্ক নর-নারীতে পরিণত হয়ে উঠবে। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তাঁদের এ আশা পূর্ণ হয় না। আমাদের নীরবতার ফলে শিশুরা বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে এমন সব জ্ঞান লাভ করে থাকে, যাতে তার যৌন-চেতনা সুস্থ ভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। ফলে উত্তর কালে তার স্বভাবের মধ্যে নানান রকম দুশ্চিন্তা, যৌন বিকৃতি ও অনাচার দেখা দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে কণ্টকিত করে তোলে।

আমরা যতই নীরবতা অবলম্বন করি না কেন, দেখা গেছে অতি শৈশব থেকেই মানুষের যৌন-চেতনা বা যৌন-বোধ পরিস্ফুট হয়। মলমূত্র ত্যাগ, প্রজনন অঙ্গের সাময়িক পুলক, বালক-বালিকার বিভিন্ন দৈহিক গঠন অবলোকন প্রভৃতির থেকেই শিশু ও বালকদের মনে যৌন চেতনার সূত্রপাত হয়। একটু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা অন্যান্য প্রশ্নের মত দেহ সংক্রান্ত ও জন্ম সংক্রান্ত নানা বিষয় প্রশ্ন করে থাকে। এর সোজা উত্তর দিতে গিয়ে অভিভাবকরা যদি ইতস্তত করেন বা লজ্জা বোধ করেন তাহলে শিশু সেটা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। সে মনে মনে এই ধারণা করে যে বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব একটা লজ্জার এবং ফলে সে যদি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়ে তাতেও কিছু আশ্চর্য হবার নেই। মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন যে বালক বালিকাদের যৌন কৌতূহলকে যতটা উপেক্ষার সঙ্গে দেখা যায় ততটাই ভালো। অপর পক্ষে অভিভাবকেরা যতই এ বিষয়ে কড়া শাসন করবেন বা ভয় দেখাবেন, ততই তারা গোপনীয়তার আশ্রয় নেবে এবং আগের চাইতে বেশী করে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবে।

অভিভাবকেরা প্রায়ই এই ভেবে উদ্বিগ্ন হন যে, এই বিষয়টি

নিয়ে ছেলেমেয়েদের তাঁরা কোন্ সময়, কী ধরণের শিক্ষা দেবেন ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সব চেয়ে ভালো সময় হচ্ছে আপনা থেকেই সে যখন যেটুকু জানতে চায় সেইটুকু ; আবার এও দেখতে হবে উত্তরটা যেন তার উপযোগী হয়। ছোট শিশু মটর গাড়ী দেখে প্রশ্ন করতে পারে এটা কি ? জবাবে আপনি হয়তো বলবেন, "পোঁ পোঁ গাড়ী বা বেড়ু করতে যাবার গাড়ী।" কিন্তু তাই বলে কি আপনি বলবেন যে মটর গাড়ী কেমন করে তৈরী হলো ? তার যন্ত্রপাতি কি ধরণের, যানবাহন কত রকমের আছে ইত্যাদি ? এসব তার কাছে অর্থহীন লাগবে। বয়সের সাথে যখন তার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিধি বাড়বে তখন বিস্তারিত বিষয় সে বুঝতে শিখবে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েরা তাদের বিশেষ ধরণের শারীরিক ধর্মাদি লক্ষ্য করে অনেক সময় অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রবৃত্তির বিশেষ তাড়নায় আত্মরতিতে রত হয়ে অনেক সময় আবার নিজেকে অপরাধী মনে করে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটায়। দৈহিক বিকাশ ও পরিপুষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি নর-নারীকে যে ভবিষ্যতের জনক-জননী রূপে প্রস্তুত হতে কতখানি সাহায্য করছে, এসম্বন্ধে ভীরু তরুণ মনকে আশ্বস্ত করলে, অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে বলেই মনে হয়। মা-বাবা যদি এসব আলোচনা করতে ইতস্তত বোধ করেন, তবে পারিবারিক চিকিৎসকের সাহায্য নিতে পারেন।

এই সময় বা কিছু পরে সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি কৌতূহলী হতে দেখা যায়। সীমিত পর্যায়ে এটা ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা সুস্থ ও সহজ লক্ষণ বলেই ধরতে হবে। এই আকর্ষণ যে বালক-বালিকার দৈহিক গঠনের পার্থক্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তা নয়। এর মধ্যে আরও এমন কতগুলি মনোভাব আছে যার প্রভাব বালক-বালিকার জীবনে অনস্বীকার্য। মেয়ে-সঙ্গীদের সম্পর্কে ছেলেদের মনে থাকে

স্নেহ, কোমলতা, সংবেদনশীলতা, সাহায্য করার ইচ্ছা প্রভৃতি সুকুমার মনোভাব। এ ছাড়া নিজের নানা প্রকার দায়িত্ব সম্বন্ধেও ছেলেরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাব তাদের কাজে কথায় প্রকাশ পায়। মোটের ওপর এই বয়সে ছেলেমেয়ের মেলামেশার মধ্যে দিয়ে তাদের সমকামী ভাব কেটে যায় এবং ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবন গঠনেও অনেক সাহায্য করে।

সুস্থ যৌন চেতনার বিকাশের অর্থ শুধু এই নয় যে, নর-নারীর দেহভেদের জ্ঞানলাভ করা। সমাজ-জীবনে নর-নারীর পবিত্র দাম্পত্য বন্ধন কেন গুরু দায়িত্বপূর্ণ? ব্যক্তিগত দৈহিক পবিত্রতা, সুন্দর স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে কত সহায়ক? নারীর সম্মান ও আদর্শ রক্ষা কেন মহত্তর বিষয়? এসবও যৌন শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত বলে মনে হয়। ছেলেমেয়েদের সুস্থ যৌন-বিকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব যখন মা-বাবারও এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি, শান্ত, সুস্থ ও সবলভাবে গড়ে ওঠে। যথেষ্ঠ পরিমাণে খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, সুস্থ প্রতিযোগিতা, গঠনমূলক কাজ, সংঘ-জীবন, ভ্রমণ, বিশেষ খেয়ালের (**Hobby**) মারফতও যে প্রবৃত্তির তাড়নাকে সুপথে চালিত করা যায় এ বিষয়ে অভিভাবকদের অবহিত হওয়া দরকার।

অভিভাবক, শিশু ও চারিত্রিক উপাদান

শিশুর চরিত্র গঠন সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পড়েছি, এখন অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের চরিত্রগঠনে কোন্ কোন্ বিষয়গুলির প্রতি নজর দেবেন, সে দিকটা আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তিতে আসবো।

চরিত্র গঠনের বিশেষ উপাদান হিসাবে অনেকেই চা[illegible]ণকে বিশেষ স্থান দিয়েছেন। এই চারিটি হচ্ছে সরলতা, সামাজিকতা, গুণগ্রাহিতা ও স্বাবলম্বন। দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই

কিন্তু আবার এই গুণগুলির প্রচারের চেয়ে প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশী ক'রে।

সরলতা :—সত্যবাদিতা, দয়া, ন্যায়-পরায়ণতা, সাধুতা অভ্যাস করানোর জন্য বাড়ীতে শিশুদের কাছে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে বা এসব না মানার ভয়াবহ ফল তুলে ধরলেও বিশেষ কোন ফল হবে না। এগুলি চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে হলে, এমন পরিবেশের মধ্যে তাদের মানুষ করতে হবে যেখানে এগুলি তাদের জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। পারতপক্ষে এর বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন যাতে শিশুকে হতে না হয় সেদিকে অভিভাবকদের নজর দিতে হবে। ন্যায় অন্যায় বেছে নিতে শিশুকে যেন দ্বিধার মধ্যে না পড়তে হয়। অনেক সময় অতি শাসনের ভয়েই শিশু মিথ্যাচারী হতে বাধ্য হয়। এমন যেন দৈনন্দিন জীবনে না ঘটে। শিশুর কাছে আপনার ভুলকে ভণ্ডামির দ্বারা ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। তাকে মিথ্যা স্তোক দেবেন না। ভয়ের দ্বারা শিশুর বাধ্য-বাধকতা আনতে চেষ্টা না করাই ভালো। দরকার হলে তাকে দৈহিক শাস্তি দিন—তবে এই শাস্তি যেন তার যথার্থ প্রাপ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

সামাজিকতা :—সামাজিকতার মধ্যে পড়ে, মধুর ব্যবহার, পরের জন্য কিছু করতে সচেষ্ট হওয়ার ইচ্ছা, অন্যের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, অন্যের সুবিধা অসুবিধা ভাববার শক্তি দান ও পরিগ্রহণ এবং দলীয় খেলায় নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা বোধ।

এই সব গুণগুলির উৎকর্ষ সাধন করতে হলে অবিশ্যি পরবর্তী কালে ঘরের চেয়ে বাইরের সংস্পর্শেই শিশুকে আসতে হয় বেশী ক'রে। আজকের দিনে ক্লাব, সংঘ-জীবন, ব্রতী বালক দল ইত্যাদির সদব্যবহারের সুযোগ শিশুকে দিলে সুফল পাওয়া যায়। তবে এইখানে আবার অভিভাবকের দেখা দরকার শিশু যেন কুসঙ্গে না পড়ে।

ছোটদের সামাজিক চেতনার উৎকর্ষ আনতে হলে, তাদের ছোট বড় সব বয়সের লোকের সঙ্গেই মেলামেশার সুযোগ দিতে হয়। যে ছেলে বৃদ্ধ বা বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বিরক্তি বোধ করে, হাজার লেখাপড়ায় ভালো হলেও ধরে নিতে হবে তার শিক্ষা ঠিক মত হয়নি। বিভিন্ন বয়সী লোকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশার সুযোগ বাড়ীতেই ছেলেমেয়েদের দেওয়া উচিত। এর মধ্যে দিয়ে তারা বুঝতে পারে যে কার কতখানি দেবার আছে বা গ্রহণ করবার আছে। প্রত্যেক দিন বাড়ীর কোন না কোনও কাজে অংশ গ্রহণ করা শুধু মেয়েদের নয় ছেলেদেরও একটা শিক্ষার দিক বলে গণ্য হওয়া উচিত।

গুণগ্রাহিতা **:**—অন্যের যা কিছু ভালো, সুন্দর, মহৎ ও বিশেষ গুণকে হৃদয়ে গ্রহণ করা এবং ঐরূপ গুণের অধিকারীকে সম্ভ্রম ও অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখাকে আমরা গুণগ্রাহিতা বলতে পারি। সুন্দরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মধ্যেই নিহিত আছে নৈতিক উন্নতির পথ। এই হৃদয়গ্রাহী ভাবটির সঙ্গে যখন স্নেহ, কৃতজ্ঞতা এবং বিস্ময়ের রঙ লাগে তখন তা রূপান্তরিত হয় শ্রদ্ধায়। শিশুর কাছে মা-বাবা এই রকম শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু অনেক সময় শ্রদ্ধার মধ্যে হৃদয়ের এই যোগাযোগটুকু থাকে না। যেখানে ভালোবাসার সঙ্গে এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ভাবটি যুক্ত হয়ে থাকে সেখানে শিশুর ওপর অভিভাবক অসীম প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এই প্রভাবের দ্বারা জগতে যা কিছু সুন্দর মহৎ—যা তাঁরা মনে সত্য সুন্দর বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, তার দিকে শিশুর মনকে সহজেই চালিত করতে পারেন। হাজার শিক্ষার দ্বারাও যা সহজে হয় না তাই এই হৃদয়গ্রাহী শ্রদ্ধার প্রভাবে সহজে শিশুর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়।

স্বাবলম্বন **:**—মা-বাবা শিশুর একমাত্র অবলম্বন সন্দেহ নেই; কিন্তু শিশু যদি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একান্তভাবে পরনির্ভরশীল

থেকে যায়, তাহলে উত্তরকালে বৃহত্তর জগতে তার চলা ফেরা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তাই শিশু যাতে ছেলেবেলা থেকেই আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে চলতে পারে, নতুন অবস্থা ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে ভয় না পায় সেই শিক্ষা তাদের শিশুকাল থেকেই বয়সানুপাতে হওয়া দরকার। নইলে শিশুর "চিরশিশু" হয়ে থাকারই সম্ভাবনা বেশী।

মা-বাবারাও অনেক সময় ছেলেমেয়েদের চিরকাল স্নেহের অঞ্চলে রাখতে চান। ছেলে যে বড় হয়েছে এ কথা তাঁরা ভাবতে পারেন না এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা বয়স্ক ছেলেদেরও দুধের বাটি মুখে ধরেন, মুখ মুছিয়ে দেন ইত্যাদি আরও নানান রকম শিশুসুলভ ব্যবহার তাদের সাথে করে থাকেন। ছেলে যদি আপন ইচ্ছামত কিছু করে তাতে তাঁরা অত্যন্ত মানসিক আঘাত পান।

শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিশুকে স্বাবলম্বী ও আত্ম-নির্ভরশীল হতে শিক্ষা দেওয়া দরকার। শিশুর সামর্থ্যের উপযোগী কাজ দিয়ে তার সাফল্যে উৎসাহ দিয়ে, তার নিজস্ব মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে, অহেতুক বিকৃত ভয় ও অতি আদর থেকে তাকে দূরে রেখে, অভিভাবকরা শিশুর মনে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ

"ব্যক্তিত্ব" কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। নানান ক্ষেত্রে কথাটি নানান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে মোটামুটি "ব্যক্তিত্ব" বলতে আমরা বুঝি মানুষের একটা সামগ্রিক রূপ। এই সামগ্রিক রূপের মধ্যে তার দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, তার বিশেষ কর্মদক্ষতা তার সামাজিক আচার-ব্যবহার, তার চিন্তাধারা ইত্যাদি সব কিছুই ফুটে ওঠে। ব্যক্তি বিশেষের যে-স্বকীয় বিশিষ্টতা তাকে অন্যের থেকে আলাদা ভাবে দেখতে শেখায় তাকেই ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্ব' বলা যেতে পারে।

অতি শৈশব থেকেই নানান পর্যায়, নানান অবস্থার মাঝে পড়ে 'ব্যক্তিত্বে'র রূপান্তর ঘটে। ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ বা রূপান্তর কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সীমাবদ্ধ দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতাই মানুষের নতুনতর কার্যকলাপের ওপর অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিজের চাল চলন ও তার প্রতিক্রিয়া দেখেই মানুষ তার জগতে নিজের মতন মানিয়ে গুছিয়ে নিজস্ব ধারা অনুযায়ী এই সমাজে ও মানুষের মাঝে চলতে সচেষ্ট হয়। এমনি ভাবেই গ'ড়ে ওঠে তার সুস্থ ব্যক্তিত্ব। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক এ্যালপোর্ট ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে তাই বলেছেন যে, ব্যক্তিত্ব হ'লো মানুষের সেই সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেশ সুন্দর ভাবে মানিয়ে চলতে সমর্থ হয়।

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এই দুই বস্তুই এমন ভাবে মিশে থাকে যে, তাকে আপাত দৃষ্টিতে আলাদা ক'রে দেখা কঠিন। কিন্তু একটু চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, চরিত্রের বেলায় খাপ খাইয়ে চলার কোন বালাই নাই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বেলায় থাকে নিজেকে মানিয়ে গুছিয়ে চলার ব্যাপার। একজন মানুষ রাগী, খিট্‌খিটে বা বদ্‌মেজাজের হতে পারে এবং তার এই স্বভাব তাকে অসামাজিকও ক'রে তুলতে পারে। তাই ব'লে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কিছু অদল বদল হবার কারণ নেই। চরিত্রের বেলায় আমরা দেখি মানুষ কতখানি সত্য, ন্যায়-নিষ্ঠা, সাধুতা, অসাধুতা বা আত্ম-প্রবঞ্চনার দ্বারা চালিত হচ্ছে আর ব্যক্তিত্বের বেলায় দেখি মানুষ তার ব্যর্থতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সবলতা, দুর্বলতা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে সে এই বৃহত্তর সমাজের মানুষ হিসাবে এগিয়ে চলেছে এবং কার্যকরী হচ্ছে।

এখানে দেখবো শিশুর আবেগ-অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা, আচার

আচরণ কতটা তার আত্ম-সন্তোষ উৎপাদন করছে এবং ভবিষ্যৎ সমাজের কার্যকরী নাগরিক হিসাবেই বা তার কতখানি আত্ম বিকাশ ঘটছে।

ব্যক্তিত্বের প্রকার ভেদ

মনস্তাত্ত্বিকেরা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক হ'লো বহির্মুখী (extrovert) মানুষ আর এক হ'লো অন্তর্মুখী (introvert) মানুষ। যারা বহির্মুখী ধরণের মানুষ, তারা বহুলোকের সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বক্তব্য বা মতামত জাহির করতে চায়, নিজের মতে অপরকে আনবার জন্য নানা রকমের প্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে থাকে, সহজেই বন্ধুত্ব করতে পারে, অপরচিত লোকের মাঝখানে লজ্জা বা ভয় পায় না, দলের অধিনায়ক হ'তে ভালো বাসে ; আর যারা 'অন্তর্মুখী' মানুষ তারা নিজেদের সম্বন্ধে নানা দুশ্চিন্তা পোষণ করে, অপরে কি বললো, কি ভাবলো তাই নিয়ে মাথা ঘামায়, অপরের কার্য-কলাপের মধ্যে নানা রকম উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায়, সহজে অপরকে সন্দেহ করে, 'হীনমন্যতা'-দ্বারা নিজেকে অকারণে পীড়িত করে, সহজে বিচলিত হয়ে পড়ে, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল হয়ে থাকে। একথা মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে পৃথিবীর সকল মানুষই হয় 'অন্তর্মুখী' না হয় 'বহির্মুখী'। অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যক্তিত্ব পূরোপূরি 'অন্তর্মুখী' বা পুরোপুরি 'বহির্মুখী'-র পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব মধ্যপথ আশ্রয় ক'রে বিকশিত হয়।

ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পরিবেশ

পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এবং এই প্রতিক্রিয়া তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। দেখা গেছে, ভয় পেলে কোন শিশু পিছনে হ'টে যায় ; কেউ বা জড়-সড় হ'য়ে

পড়ে আবার কেউ বা খুব চেঁচিয়ে চীৎকার ক'রে থাকে। আবার দেখা গেছে ভয় পেয়ে কোন কোন শিশু বা বালক নীরব ও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ভীত হ'য়ে বালক বা শিশু ভয়ের বস্তুটিকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য নানাভাবে ক্রোধ প্রকাশ করে ও ভয়ের জিনিসকে এমন কি আক্রমণ করতেও ছাড়ে না।

বাইরে থেকে দেখলে যে সকল ব্যবহার সদৃশ মনে হয়, একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে অনেক সময়ে তার ভেতরে রয়েছে অসামান্য জটিলতা। লেখাপড়ায় একটি শিশু পিছিয়ে পড়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হয়তো তার দৈহিক কোন নূন্যতার জন্যেই এই ব্যাপার ঘটছে, হয় তো তার চোখ খারাপ এবং চশমা দিলেই সেই দোষ কেটে যাবে, অপর একটি বালকের পড়াশুনার ব্যাপারে কতকগুলি কু-অভ্যাস হয় তো বাধার সৃষ্টি করছে আবার অন্য ক্ষেত্রে হয়তো দু'টি ভাইএর মধ্যে রেষারেষির ফলে একটি ভাই নিজের লেখাপড়ার উন্নতির পথ তৈরী না ক'রে শুধু কি ক'রে অপরকে জব্দ করা যাবে সেই চেষ্টাই করছে।

বালক বালিকার বাইরের আচরণ দেখে তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা সুকঠিন। অনেক সময়ে বালক বালিকারা তাদের মনোভাব গোপন ক'রে রাখে এবং বাইরে এমন ধরণের আচরণ ক'রে থাকে যার সঙ্গে তার মনোভাবের সম্বন্ধ একেবারে বিপরীত। সামাজিক নীতি-বোধের চাপে অনেক সময় বালক বালিকারা মনোভাব গোপন করতে বাধ্য হয়।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধারা

জীব-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, যা কিছু জন্মায় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তা সবই যেন একটা পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ঘটে থাকে। একের পর এক যথাকালে জীবের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়,

এবং তা একত্র হ'য়ে তার সামগ্রিক কাজের পরিচয় প্রদান ক'রে থাকে। এই বিকাশের ধারা যদি কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় বা যথা সময়ে না দেখা দেয়, তাহলে শুধু বাধা প্রাপ্ত অঙ্গের ক্ষতি হয় না বা বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায় না—সমগ্রভাবে জীবের বিকাশও বহুলাংশে ব্যাহত হয়। পারম্পর্য রক্ষা করে জীবের আঙ্গিক বিকাশ ঘটলে, তবেই প্রাণীর কার্যপ্রণালী সুষম, সুসংহত ও অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে।

মানুষের ব্যক্তিত্বও জীব-বিজ্ঞানের এই রকমের এক জটিল ধারা অনুসারে গড়ে ওঠে। তবে এর প্রকাশ শিশুর আঙ্গিক বিকাশে ততটা দেখা দেয় না,—যতটা দেখা দেয় তার গতিদায়ীশক্তি (**Locomotor**), অনুভব-শক্তি ও সামাজিক বোধ শক্তির বিকাশে এবং আপন অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষমতায়। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এগুলির পূর্ণতালাভ করার গুরুত্ব যে কতখানি তা সকলেই অনুমান করতে পারেন।

ব্যক্তিত্বের উপাদান

শিশু লালনে দেখা যায় যে, শিশুর বড় হওয়ার প্রতিটি স্তরেই কতকগুলি বিশেষ সমস্যার আবির্ভাব ঘটে। এই সমস্যাগুলি যদি সময় মত ঠিকভাবে মেটাতে পারা যায়, তবে পরবর্তী স্তরে শিশুর বিকাশের পথ সহজ হ'য়ে ওঠে। বিকাশের ধারাকে সহজ পথে চালানোর জন্য প্রত্যেক স্তরেই শিশুর জন্য প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, উৎসাহ এবং সুনির্দেশ। শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও গঠনের পক্ষে কি কি প্রয়োজন তা এইভাবে অল্প কথায় বলা যাক।

শিশুর বিশ্বাসবোধ :—শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রয়োজন তার মনে বিশ্বাস বোধ জাগা। এই পৃথিবীটা যে তার পক্ষে একটা নিরাপদ নির্ভরযোগ্য স্থান, এ বোধটা শৈশব থেকেই তার মনে জাগা দরকার। অতি শৈশবে তার মনে এ বোধ জাগে না

ঠিকই কিন্তু চার পাঁচ মাস বয়স থেকে দেখা যায় যে, শিশু তার পরিচিতদের বিশ্বাস করতে পারে—তাদের ওপর নির্ভর করতে পারে। চুষিকাঠি, খেলনা ইত্যাদি ধরা, হামা, চলা ফেরা এই সব কাজের মধ্যে শিশুর পেশী সকল পুষ্ট হয় এবং এই সবের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে শিশুর নিজের দৈহিক সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস আসে।

এই সময়ে মায়ের স্নেহ, ভালোবাসা নিরাপত্তার অভ্যাস ইত্যাদি শিশুর পক্ষে বিশেষ দরকার। দেখা গেছে, শৈশবে মায়ের স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকলে বা তার অভাব থাকলে শিশুর আচার আচরণে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়. এমন কি স্নেহের অভাবে শিশুর স্বভাব যদি অপরাধ প্রবণতার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিশুর স্বাধীন স্পৃহা :—শিশুর মনে বিশ্বাস-বোধ দৃঢ় হলেই সে নিজে নিজে সব কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে। সে এটা নেয়, সেটা নাড়ে চাড়ে, 'ওটা কি' দেখতে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, নিজের জামা নিজে পরতে চায়, সব কিছুতেই "আমি করবো", ভাবটা দেখায়। এই সময় অভিভাবকদের কঠোর পরীক্ষায় পড়তে হয়। কারণ একদিকে তাঁদের নজর রাখতে হয় যে, শিশুর যথেচ্ছ ব্যবহার যেন স্বভাবের অঙ্গ না হয়ে দাঁড়ায় আবার অন্য দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, শাসন বারণের ফলে তার ব্যক্তিত্ব ভয়ে যেন একেবারে সংকুচিত হয়ে না পড়ে।

শিশুর উদ্যম :—চার পাঁচ বছর বয়সে শিশুর মনে দেখা দেয় 'বাবার মতন বড় হওয়ার সাধ।' এই সময় বড়দের অনুকরণ ক'রে অনেক কিছু করার ইচ্ছা তার মনে জাগে, বাস্তবে না পারলেও কল্পনার পাখায় ভর করে সে চলতে পারে অনেক দুর। তা ছাড়া এই সময় বিবেক-বোধ দানা বাঁধাতে, তার কাজকর্ম বড়রা

পছন্দ করবে কি না ? সে ভয়ও শিশুর মাঝে দেখা দেয়।

সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিশুর উদ্যম-উৎসাহকে সুনজরেই দেখা উচিত। প্রশংসা, উৎসাহ এসব ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী। শাস্তির মাত্রা যত কম রাখা যায় ততই ভালো।

শিশুর আত্মপ্রসাদ :—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর উচ্ছ্বাস ও কল্পনাপ্রবণতা অনেকাংশে কমে যায়। তখন সে যথার্থভাবে শিখতে চায় কেমন ক'রে দৈনন্দিন কাজকর্ম সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা যায়। ছোটখাটো দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারলে, তার মনে খুব আত্মপ্রসাদ জাগে এবং সে আপন যোগ্যতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে ওঠে। সুপরিচালিত হলে এবং পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটলে শিশুর শিক্ষা স্থিরভাবে অগ্রসর হয়। সহযোগিতা, মেলামেশা, খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্যে তার সামাজিক বোধ জাগ্রত হয়।

এই সময় ঠিকমত চালিত না হলে শিশুর মনে হীনমন্যতা বোধ এবং আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস জাগতে পারে। এর থেকে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'অন্তর্মুখী' ভাব আসাও কিছু আশ্চর্য নয়। বিদ্যালয়-জীবন শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে থাকে। ক্ষমতানুযায়ী পাঠ ও কাজ দিলে শিশুর অকৃত-কার্যতার সম্মুখীন হবার ভয় কম থাকে। শিশুর কৃতিত্বের স্বীকৃতি শিশুর ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে তোলার পক্ষে অনেক খানি সাহায্য করে। শিশু-অপরাধীদের জীবন পর্য্যালোচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, যারা বিদ্যালয় জীবনকে ঘৃণার চোখে দেখে এসেছে তারা প্রায়ই বিদ্যালয় থেকে ঘৃণা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নিরুৎসাহই পেয়ে এসেছে। প্রতিদিন তারা শুনেছে অন্যের তুলনায় তারা কত বোকা, কত হীন ইত্যাদি।

উপসংহার

ব্যক্তিত্ব গঠনে যে কটি স্তর-বিকাশের কথা সংক্ষেপে বলা হ'লো একের পর এক তার ত্রুটি ও সংকটের দিকটা যদি শিশুরা কাটিয়ে উঠতে পারে তবে বলা যেতে পারে যে শিশুর ব্যক্তিত্ব একরকম ভালোভাবেই গ'ড়ে উঠবে। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। কারণ এই সব স্তর ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। এই সবের মধ্যে নাম করা যেতে পারে শিশুর স্বাস্থ্য, দৈহিক বিকাশ সমাজ ও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা, মাতাপিতার মাতৃত্ব-পিতৃত্ব বোধ, ভাবাবেগ, আদর্শের প্রতি অনুরাগ, সামাজিক কৃষ্টির মান ইত্যাদি।

---

* প্রথম প্রকাশ, জুন—১৯৫৪

* সম্পাদক
নির্মল চৌধুরী

* প্রকাশক
সলিল পাল
'কিশোর কল্যাণ কেন্দ্রে'র পক্ষে
১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন
হাওড়া

* শিল্পী
রামকৃষ্ণ দত্ত
অরবিন্দ রায়

* মুদ্রক
শ্রীঅশোক কুমার মল্লিক
শ্রীদুর্গা প্রেস
২।০ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন
হাওড়া

* প্রাপ্তিস্থান
অশোক লাইব্রেরী
১৫।৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ ষ্ট্রীট)
কলিকাতা—১২

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

শিশু-লালনী গ্রন্থমালা শিশু-লালনী গ্রন্থমালা শিশু-লালনী গ্রন্থমালা
শিশু-লালনী গ্রন্থমালা শিশু-লালনী গ্রন্থমালা শিশু-লালনী গ্রন্থমালা

প্রকাশিত পুস্তিকাবলী

শিশু-লালনী  গ্র ন্থ মা লা

প্রতিটির দাম
চার আনা মাত্র